Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IV, Issue-III, January 2016, Page No. 01-07
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পঃ লেখকের শিল্পকুশলতা

কৌশিকোত্তম প্রামানিক
ছাত্র গবেষক, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ. পি., ভারত

Abstract

Narayan Gangopadhaya (1918- 70) was a prominent novelist as well as a short story writer in Bengali literature. He made his presence felt in the literarary scene in the fifth decade of ninetieth century with his first noted work of fiction uponibesh (1944). It was the time marked for great political agitations all over the world and India was no exception. A lot of Bengali novelists portrayed the agitations in their novels and short stories. Amongst these politicaly conscious men of letters Narayan Gangopadhaya was a prominent figure who could not but portray characters with strong political and ideological stance in his novels who have significant bearing on the course of his narratives. His short stories offer telling and sensetive account of the famine condition that plagued Bengal in 1943, just after the august movement that rocked the nation. Many of these short stories reflect the penury and plight of both the rural and urban Bengal afflicted also by certain strata of socity who exploited the condition to their ends. The present paper intends to study how Narayan Gangopadhaya managed to depict so realisitically the condition of fimine striken Bengal of his times.

বাংলা সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর্বিভাব উনিশ শতকে চল্লিশের দশকের উত্তল সময়ে। কবিগুরু রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরেরে প্রায়ণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গোটা বিশ্বের টালমাটাল অবস্থা, ইউরোপে নাৎসী বাহিনীর পতনম্মুখতায় আগ্রসায়মানতা, ভারতবর্ষে গান্ধিজির নেতৃত্তে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের' ডাক, সর্বপরি বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরে সমগ্র বাংলার সমাজ সাহিত্যে সূচিত হয়েছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সাহিত্যের সীমানা যা পূর্বে ছিলো নির্দিষ্ট পরিসরে সীমাবদ্ধ, চল্লিশের দশকে, প্রেক্ষাপটের বিচারে তা সীমিত পরিসর পরিত্যাগ করে বিস্তৃত আকার ধারণ করল। সাহিত্যের পাতায় উঠে এল সাধারণ মন্বন্তর কবলিত মানুষ, জমিদার সন্তানদের রাজনীতি চেতনা থাকে সাধারণ মানুষের ব্যাক্তিমানসের রাজনীতি চেতনা প্রবেশ করল সাহিত্যে। চল্লিশ দশকের পূর্বে কিছু ঔপন্যাসিকের জীবন দৃষ্টিতে, জীবন চেতনায় স্ক্যান্ডানেভিয়ান সাহিত্যের বহিরঙ্গ অনুকরণে বাংলা কথা সাহিত্যের গতি শ্লথ হয়ে গিয়েছিলো। এই পর্বেই তারাশঙ্কর, মানিক ও বিভূতি এই ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা কথা সাহিত্য তার প্রাণের ধারা বজায় রেখেছিলো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার সাহিত্যে জীবনের জটিল গ্রন্থিকে অন্বেষণ, তারাশঙ্করের সামন্ততন্ত্র ও শিল্পতন্তের দ্বন্দ্বিক পটভূমিতে দাড়িয়ে অনিচ্ছুক অবধারিত শিল্পতন্ত্রের জয় ঘোষণা, বিভূতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরাচরিত, শাশ্বত জীবন সৌন্দর্যকে সাহিত্যে চিরস্থায়ী রূপে অঙ্কনের প্রয়াসে বাংলা কথা সাহিত্য নতুন দিক উদ্ভাসিত হয়েছিলো।

১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনের এক বছর পরেই, ১৯৪৩ সালে বাংলার বুকে নেমে এসেছিল এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষ। বাংলার সমাজ ইতিহাসে যাকে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বিশেষণের অভিধায় ভূষিত করেন বাংলার সমাজ ইতিহাসকারেরা। চল্লিশের দশকের এই ভয়াবহ সময় কালে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ঔপন্যাসিকরা ব্যাপক রাজিনীতি চেতনায় মত্ত ছিলেন। রাজনীতির উত্তাল আন্দোলনে তাদের উপন্যাসের চরিত্রগুলির মানস চেতনা ছিলো উদ্দীপিত। যার প্রতিফলন আমরা পাই সতীনাথ ভাদুরীর 'জাগরী' (১৯৪৫), 'ঢোড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯) নবেন্দু ঘোষের 'ডাক দিয়ে যাই' (১৯৪৬), গোপাল

হালদারের 'পঞ্চাশের পথ' (১৯৪৪), 'তেরোশো পঞ্চাশ' (১৯৪৫), 'উনপঞ্চাশী' (১৯৪৬), সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪) প্রভৃতি উপন্যাসে। রাজনীতি সচেনতা লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-৭০) মধ্য বর্তমান। এই সময় কালীন তার বিভিন্ন উপন্যাস 'তিমিরতীর্থ' (১৯৪৪), 'মন্দ্রমুখর' (১৯৪৫), 'বৈতালিক', (১৯৪৮)-এর উপন্যাসের চরিত্রদের কর্মপন্থা লেখকের রাজনীতি সচেতনতারই সাক্ষ্য বহন করে।

সাহিত্য মানেই সমাজ, শুধু উপন্যাস নামক সাহিত্য শাখার গণ্ডিতেই সমাজ সীমাবদ্ধ নয়। তা কবিতা, নাটক ছোটগল্প এবং অন্যান্য সাহিত্যপ্রকরণেও তার সুচিন্তিত অভিপ্রকাশ। সমাজকে বাদ দিয়ে কখনো সাহিত্য রচিত হতে পারেনা। সাহিত্যের মূল অভিপ্রায় রস হলেও তা সমাজগত প্রেক্ষাপট থেকে স্বতোউৎসারিত হয়ে থাকে। একজন সমাজ সচেতন শিল্পী হয়ে অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতোই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও তার রচিত সাহিত্যে সমকালীন সমাজের সময়সীমাকে লক্ষ্য করেছেন, অনুধাবন করেছেন, আর তাকেই সাহিত্যের পাতায় উপজীব্য করে তুলেছেন যথাযথ ভাবে। অনিবার্য ও অনস্বীকার্যভাবেই তার ছোটগুল্পগুলিতেও উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজ, যেভাবে এসেছে তাঁর উপন্যাসগুলিতে।

১৩৫০ এর মন্বত্বর কবলিত গ্রাম বাংলা, সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী এক অভাবনীয় পৈশাচিক জৈবিক ক্ষুধা জেগে উঠেছিলো কালোবাজারী মহাজনদের শোষনে ও ঘুসখোর প্রশাসনের সহযোগিতায়। ক্ষুধাকে নিবৃত্তি করে একমুঠি অন্নের আশায়, এক বাটি ভাতের ফ্যানের আশায় অসংখ্য গ্রাম সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের দল উঠে এসেছিল রাস্তার বুকে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক তার জলন্ত প্রতিচ্ছবি। এই সময়কালীন প্রেক্ষিতে দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলার মানুষের অবস্থাকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'নক্রচরিত' 'দুঃশাসন' 'হাড়' 'ডিনার' ও 'ভাঙ্গা চশমা' প্রভৃতি ছোটগল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

'নক্রচরিত' গল্পে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামীণ সমাজের প্রেক্ষাপটে সমাজের এক রূঢ় বাস্তবসত্যর পরিচয় দিয়েছেন লেখক। গল্পের মূল চরিত্র নিশিকান্ত গ্রামের আড়তদার কালোবাজার কারবারী সেই সঙ্গে ডাকাতদের বাটপার। চরিত্রটি একজন গ্রামীণ শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। তৎকালীন গ্রাম সমাজে এই সকল চরিত্র খুব সহজেই পাওয়া যায়, শুধু তাই নয় আজকের একবিংশ শতাব্দীতেও গ্রাম সমাজে এই সকল চরিত্রেরা অতিশয় বিরল নয়।

গল্পে আমরা দেখতে পাই নিশিকান্তকে দুর্ভিক্ষের বাজারে তার সমস্ত অনয় ও অসৎকর্মের জন্য ঘুস দিতে হয় ইব্রাহিম দারোগাকে। দুর্ভিক্ষের কালো বাজারে আটশো মন ধান সে মজুত করেছে তার গোলায়। কলোবাজারী কারবারে লাভের আশায় এক পুলক আনন্দ তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছে। অন্যদিকে বাইরে চেহারায় সে অত্যন্ত ভক্তিমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। হরিসভায় অষ্টপ্রহর শুনতে গিয়েছিলেন তিনি। অষ্টপ্রহর জমে উঠেছে সেই সময় বোর্ডের চৌকিদারের মুখে নিশিকান্ত শুনে গ্রামের মতি পাল ও তার স্ত্রী অনাহারে আত্মহত্যার বিভৎস মৃত্যুর খরর। দুর্ভিক্ষ নিশিকান্তর মত আড়তদারদের জন্য নিয়ে আসে বৈভব ও প্রাচুর্য। তাই নিশিকান্তর সহজ উত্তর 'যারা মরেছে, মরুক তারা। কাল পূর্ণ হলেই মানুষকে মরতে হবে কেউত আর লোহা দিয়ে মাথা বাঁধিয়ে আসে না। না খেয়ে মরছে সে তো কৃতকর্মের ফল। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির দেনা এ জন্মে শোধ করতেই হবে'। দুর্ভিক্ষ কালোবাজার কারবারী মহাজন নিশিকান্তকে দার্শনিক বোধে উদ্দীপ্ত করে দিয়েছে। এর পরেই গল্পে দুর্ভিক্ষের নগ্ন, বাস্তব রূপ উন্মোচিত হয়েছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুবাদে নিশিকান্তকে ছুটে যেতে হয় মতি পাল ও তার স্ত্রী মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করতে। মতি পালের বাড়িতে নিশিকান্তের চোখে উদ্ভাসিত হয় দুর্ভিক্ষের এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর রূপ-

> "মতি পাল বারান্দাই পড়ে আছে। পেটের জ্বালায় দাওয়া থেকে বুঝি খানিকটা মাটি কামড়ে খেয়েছিলো। একরাশ কর্দমাক্ত বমি গালের দু-পাশে বেরিয়ে আছে, মরবার আগে কী একটা অসীম কৌতুকে পৈশাচিক হাসি হেসেছিলো বলে মনে হতে পারে। পেটটা লেপটে রয়েছে পিটের সঙ্গে। কালো কালো নগ্ন পা দুটোকে দেখাচ্ছে অস্বাভাবিক দীর্ঘ-যেন ভূতের পা। আর সবচাইতে তার অমানুষিক চোখ যেন ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড ঠেলা লেগে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। একটা চোখের অর্ধেকটা খাওয়া, নিশ্চয় ইদুরে খেয়ে ফেলেছে।" (পৃ-৪২২-২৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড)

লেখকের মন্বন্তরের চিত্রকে বর্ণনা করার কুশলতা লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তার সাহিত্য চেতনার পরিচয় বহন করে।

একজন গল্প পাঠক হয়ে আমরা এর চেয়ে দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর বর্ণনা আমরা চিন্তা করতে পারি না, কল্পনা করতে পারি না কিন্তু দুর্ভিক্ষের ভয়াল রূপে যে কত মর্মভেদী ও মর্মান্তিক হতে পারে তা আমরা এই গল্পের পরবর্তী অংশে-

> 'অবর্ণনীয় একটা আতঙ্কে দাওয়া থেকে সোজা লাফ দিয়ে নিশি একেবারে হুড়মুড় করে চৌকিদারের ঘারের উপর এসে পড়লো। মতি পালের বৌ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে শেষ সম্বল ছিন্ন লজ্জাবাস দিয়েই গলায় ফাঁস পরিয়েছে- লণ্ঠনের আলোয় সেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অস্বাভাবিক নারিদেহ একটা দানবীয় বিভাষিকা যেন।' (পৃ-৪২৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড)

আজকের সমাজ মানসের সিংহাসনে বসে হয়তো লেখকের এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে। কিন্তু কল্পনার তত্ত্ব ও সমাজসত্যের সমাপাতনে যে সাহিত্য রসের সৃষ্টি তিনি করলেন তা এককথায় অনবদ্য। শুধু তাই নয় নিশিকান্তের মতো আড়তদারের মানস চেতনায় ডুব দিয়ে লেখক এক ভয়াবহ আপেক্ষ্যমান ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছেন-

> 'অসীম আতঙ্কে কেবলই মনে হতে লাগল সমস্ত বাঁশবনের পথ জুড়ে অসংখ্য মড়া ছড়িয়ে রয়েছে- তাদের কালো শুকনো পাগুলো যেন ভুতের পা। আর বাঁশের আগায় আগায় গলার কাপড়ের ফাঁস পরিয়ে ঝুলে রয়েছে অগণ্য নারীদেহ- তাদের উলঙ্গ দেহ গুলি একটা ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন। চারদিকে কি আজ মৃত্যুর সভা বসেছে।' (পৃ-৪২৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড)

গল্পের প্রধান উপজীব্য কাহিনি দুর্ভিক্ষ হলেও, নিশিকান্তর রক্ষিতা পৌঢ় যৌবনা বিশাখার সঙ্গে দারোগা ইব্রাহিমের ভোগবাদী সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অন্য আরেক ধরণের থিমকে গল্প কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন লেখক এই গল্পে। বিগতযৌবন নিশিকান্তের ভোগবাসনার তৃপ্তির অক্ষমতা ও অসহায়তার ক্রুদ্ধ আস্ফালন সঙ্গে সাজুয্য খুঁজে পাওয়া যায় মতি পাল ও তার স্ত্রীর অনাহারে মৃত্যর অসহায়তার। সেই ইমেজকে আমরা লক্ষ্য করি গল্পের শেষে-

> 'মাঠের মাঝখানে একটা গলিত গরুর দেহ আগলে বসে আছে একটা ঘেয়ো কুকুর; চারদিক থেকে শকুনেরা উড়ে উড়ে সেই মড়াটাকে ঠোকর মারবার চেষ্টা করছে; আর কুকুরটা অস্বাভাবিক প্রচণ্ড চিৎকার করে ক্ষুধার্ত শকুনগুলোকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।' (পৃ-৪২৪ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড)

'নক্রচরিত' গল্পে যেমন চালের আরতদার নিশিকান্ত ও পুলিশ দারোগা ইব্রাহিমের নামক চরিত্র দুটিকে সৃষ্টি করে গল্পে এক শোষক সামন্ততান্ত্রিক কালোবাজারী পুলিশ প্রশাসনের আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন তেমনি গ্রামীন প্রেক্ষাপটে ঠিক একই রকম পরিবেশে আমরা পাই লেখকের 'দুঃশাসন' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবীদাসকে। দেবীদাস পঞ্চাশের মন্বন্তরে কাপড়ের কালোবাজারীতে মত্ত। কাপড়ের আরতদার তারা। 'নক্রচরিত' গল্পের নিশিকান্তের সঙ্গে তার কোন চারিত্রিক ব্যবধান নেই। গল্পে দেবীদাসের ভাইপো গৌড়দাস নামক চরিত্রটিতে কিঞ্চিৎ মানবিকতার উপস্থিতিকে দেখিয়েছেন লেখক। কনস্টেবল কানাই দে ও পুলিশ দারোগা শচীকান্ত চরিত্রগুলিকে লেখক গল্পে তুলে ধরেছেন সমাজ অবস্থাকে বাস্তবতার সঙ্গে তুলে ধরতে।

গল্পে থানার দারোগা শচীকান্ত গ্রামে তার শোষণের টাকায় যাত্রা পালার আয়োজন করেছিলো। যাত্রাপালার নাম দেওয়া হয়েছিল 'দুঃশাসনের রক্তপান'। দেবীদাস নিমন্ত্রিত হয়েছিলো এই যাত্রাপালায়। এর জন্য তাকে এই দুর্ভিক্ষের দিনে 'পঞ্চাশ টাকা' চাঁদা দিতে হয়েছিলো। যাত্রপালায় সে দেখে দুঃশাসনের বধিত রক্তে দ্রোপদী তার বেণি বেধেছে। যাত্রা পালা শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে সে ও তার ভাইপো গৌড়দাস লক্ষ্য করে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রাম বাংলার এক নগ্ন রূপ কে-

> 'ঘাটের দিক থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিলো, মানুষের গলা শুনেই কোথায় মিলিয়ে গেল আবার। আর একসঙ্গেই চমকে উঠলো দেবীদাস আর গৌড়দাসের দৃষ্টি, ছলছল করে উঠলো রক্ত, মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনখানে একফালি কাপড় নেই-কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে ললুপ পৃথিবীর সামনে।' (পৃঃ ৪৪৪-৪৫ নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড)

গ্রাম বাংলার এই নগ্ন রূপের জন্য দেবীদাস ও শশীকান্তর মত ব্যক্তিরাই দায়ী। গল্পে 'যুগের দুঃশাসন' বলতে দেবীদাসের মত মহাজন ও পুলিশ প্রশাসনকে চিহ্নিত করেছেন লেখক। কিন্তু দেবীদাসের ভাইপো গৌড়দাসের অন্তঃমূখীন অপরাধবোধে ভাবিত মানস চেতনায় লেখক এক ভয়ঙ্কর সমাজ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছেন। যা লেখক তুলে ধরেছেন তার অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে-

> 'গৌড় দাসের মনে হলো যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করেছে তার ও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে।
>
> ...ওদিকে ফসলহীন রিক্ত মাঠ। তারেই ভাঙ্গা আলের ওপর দিয়ে একদল লোক কাজ করতে চলেছে- তাদের ধারালো হেঁসোগুলোতে সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠেছে। অকারণে- অত্যন্ত অকারণে বড় বেশী ভয় করতে লাগল গৌড়দাসের। অমন ঝকঝক করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা'। (পৃঃ ৪৪৫ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড)

হাঁড় গল্পে লেখক দুর্ভিক্ষ কবলিত গ্রামীণ প্রেক্ষাপট থেকে সরে এসেছেন কলকাতার শহরের পটভূমিতে। গল্পের কথক চরিত্রকে আমরা পাই প্রমথের ছেলে সম্বোধনে, নামহীন রূপে। মন্বন্তরের কলকাতায় সাধারণ একটি কেরানীচাকরির সুপারীশের জন্য সে আসে তার পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুরের বাড়িতে। কিন্তু রায়বাহাদুর তার বাড়িতে বসে তার দীর্ঘ প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে বসে যুবকের সামনে। রায়বাহাদুরের 'হাওয়াই এর হুহুলা ড্যান্স', 'স্টিভেনশান-কলস্টাইনের প্রবাল দ্বীপের দেশ'-এর অভিজ্ঞতা শোনার মত্ত যুবকের মানসিকতা ছিলো না, কিন্তু এক প্রকার বাধ্য হয়েই, চাকরি পাওয়ার আশায় তাকে শুনতে হয় রায়বাহাদুরের বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার কাহিনিকে। রায়বাহাদুর তার কাছে ব্যক্ত করে বসেন তাহিতি দ্বীপের তার সংগৃহীত দুর্মূল্য কুমারী মেয়ের হাড়ের মহিমাকে। যে হাড়ের সাহায্যে ম্যজিক বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যায়। তাহাতি দ্বীপে কুমারী মেয়েকে বলি দিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে যে হাড় সংগ্রহ করা হয় সেই হাড় মাঝ সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার পর তাকে যে ব্যক্তি সমুদ্রের তলা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারে সেই হয় হাড়ের প্রকৃত মালিক। গল্পে কথক চাকরি যুবককে গল্পের কথক চাকরি প্রত্যাশী যুবককে গল্পের শেষে চাকরির সুপারিশ দেন নি রায়বাহাদুর। পরিবর্তে একরাশ অ্যাডভ্যাঞ্চারাশ অভিজ্ঞতাকে শুনিয়ে বাঙালি ছেলেদের ঘরকুনোতার জন্য তাকে ভর্ৎসনা করেছে।

গল্পে যেমন একদিকে রয়েছে বীভৎস দুর্ভিক্ষ পীড়িত কলকাতার ফুটপাতের মানুষের চিৎকার ও অন্যদিকে রয়েছে সভ্য সমাজের মানুষের অসভ্য রকমের বিলাসিতা। একদিকে সুগন্ধি গ্যান্ডিফ্লাওয়ারের গন্ধ ও অন্যদিকে বুভুক্ষের নোংরা গন্ধ। এই দুই শ্রেণির পারস্পরিক বৈপরীত্যের চিত্রকে তুলে ধরেছেন লেখক। কলকাতায় মানুষ না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে অন্যদিকে রায়বাহাদুরের তাহিতি দ্বীপের হাড়ের মহিমায় এক অভাবনীয় বিলাস গল্পটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত ও রসময় করে তুলেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত বুভুক্ষদের আত্ম চিৎকারে ঘুম হয়না রায়বাহাদুরের 'পার্কের এই ডেস্‌টিচ্যুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমানো যায় না। বোধ হয় খাবার দাবার মিলেছে তাই এই চিৎকার। খেতে না পেলে চিৎকার করবে খেতে পেলে ও তাই'। এই হল কলকাতার যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে নিরন্ন মানুষদের সম্পর্কে তৎকালীন সমাজে উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের মূল্যবোধ। মূল্যবোধের অবক্ষয়ে অবক্ষয়িত কলকাতা সমাজ, সেই সমাজে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য রয়েছে শুধু মৃত্যু। গল্প কথকের অনুভূতিতে ধরা পড়েছে দুর্ভিক্ষের কলকাতার অমানবিক চিত্র-

> 'সমানে ডাস্টবিন। পাশের অবগুণ্ঠিত ল্যাম্পপোষ্ট থেকে একটা ছোট আলোক চক্র পড়েছে তার উপর। তিন-চারজন অমানুষিক মানুষ তার ভিতরহাত ডুবিয়ে খুঁজছে খাদ্য। একটু দুরেই একটা কঙ্কালসার কুকুরের ছায়ামূর্তি- নতুন প্রতিযোগীদের কাছে ভিড়বার সাহস পাচ্ছে না। কাটির মতো হাত-পা আর বেলুনের মত পেটওয়ালা একটা ছোট ছেলে দু-হাতে কি চুষছে প্রাণপণে। হাড়? হাঁ হাড়ই তো'। (পৃঃ ৫৭৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী প্রথম খণ্ড)

তাহিতি দ্বীপে কুমারী মেয়েকে পুড়িয়ে সেই যাদুবিদ্যার হাড়কে সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু গল্প কথকের অনুভূতিতে 'তাহিতি দ্বীপে মানুষ পুড়ছে না, পুড়ছে কলকাতায়'। গল্পে রায়বাহাদুর তাহিতি দ্বীপের হাড় সংগ্রহ করেছে কিন্তু যাদুবিদ্যায় সে হাড়কে কাজে লাগানোর মন্ত্র সে পায়নি। এই গল্পেও লেখক গল্প কথকের মানস চেতনায় ডুব দিয়ে এক অভাবনীয় আপেক্ষ্যমান ভয়ংকর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিলেন। উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি তার 'নক্রচরিত ও দুঃশাসন' গল্পে লেখক যেমন বিপ্লবের ও অসন্তোষের ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পের শেষে, ঠিক তেমনি এই গল্পের শেষে গল্প কথক উমেদার চাকরি প্রত্যাশী যুবকের অন্তঃমূর্খীন ভাবনায় লেখক বিপ্লবের পদধ্বনির আগমনের বার্তাকে আরো জরালো ভাবে প্রকাশ করলেন-

> 'আমি থমকে দাঁড়ালাম কোথায় একটা সাদৃশ্য বোধ সেই বলি দেওয়া কুমারী মেয়ের হাড়খানার মতোই দেখতে। যার গুণে তাহিতির আকাশে রুধিরক্ত মেঘ ভেসে উঠে, ঝড়ের সঙ্গে আগুনের ঝাপটা বয়ে যায়, ঝর ঝর করে ঝরে তাজা রক্তের বৃষ্টি। কলকাতার আকাশে ও কি মেঘ করেছে ভালো করে তারাগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না? ওই

> কালো রঙের আকাশের রঙ আগুনের মত লাল হয়ে উঠবে, এই ম্যালেরিয়া গন্ধ-জড়িত মিটে হাওয়ায় ঝরো আগুনের ঝলক কবে লকলক করে বয়ে যাবে?' (পৃঃ ৫৭৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী প্রথম খণ্ড)

গল্পের ব্যঞ্জনাধর্মী আমাদের অবাক করে দেয়। বিশেষত 'হাড়' শব্দের মধ্য দিয়ে লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে কলকাতার বুকে এক বিপ্লবের প্রত্যাশা করেছেন। ডাস্টবিনে নিরন্ন বালকের হাড় খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়েই এই গল্পের পরিসমাপ্তি 'হাড় ওরা পেয়েছে কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকী'।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের করাল গ্রাসে ব্যক্তিমানসে কিরূপ প্রভাব পড়েছিলো তার একটি আলেখ্য আমরা পাই লেখকের 'ডিনার গল্পের'। ডিনার গল্পের কথক রঞ্জন, কিন্তু গল্পের মূল চরিত্র হলো রমাপতি। পর পর তিন বার আই.এ. পাশ করতে না পেরে সিনেমার ব্যবসায় নেমেছিলো রমাপতি। গল্প কথকের কথায় সিনেমার নায়কের চরিত্রে অভিনয় নয়, সে সিনামার পার্শ্বচরিত্র নায়িকাদের খোঁজার ব্যবসা শুরু করে ছিলো। সমস্ত কলকাতার নিষিদ্ধ পল্লী থেকে মেয়েদের এনে সিনেমার পার্শ্বচরিত্র রূপে কাজ পাইয়ে দেবার ব্যবসা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে এই ব্যবসায় ফুলে ফেপে উঠেছিলো রমাপতি। নিজের কর্মসিদ্ধির জন্য নিজের ষোল বছরের ভাইঝি চম্পাকে সাহেবের কামনার শিকার রূপে বেছে নেয় সে, এরজন্য মানবিকতায় তার বিন্দুমাত্র বাধেনি। তেরোশো পঞ্চাশের মন্বন্তর বয়ে নিয়ে এসেছিলো সমাজের লজ্জাকে। পাল্টে গিয়েছিলো সতীত্ব ও নারীত্বের সংজ্ঞা। দুর্ভিক্ষের কলকাতায় নারীদের অসহায়তা ও সেই সঙ্গে তাদের উপর সামাজিক লালসায় বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো সমাজজীবন। গল্প কথকের ভাষায়-

> 'দেখতে দেখতে দেশ জুড়ে ভানুমতির কুহক লেগেছে। কাঁকর হয়ে গেল ভিটামিন 'বি', স্ট্যাডার্ড কাপড় হয়ে গেল বেনারসী; মানুষের জীবন হয়ে গেল রাস্তার কাঁকর আর মেয়েদের ইজ্জৎ হয়ে গেল ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো! নিরামিষাশী গণেশ রক্ষাকালী হয়ে নরবলি নিতে লাগলেন। যুদ্ধের ধোঁয়ার বিষণ্ণ বাংলার আকাশে রক্তের অক্ষরে স্বাক্ষর দিয়ে গেল-সাল তেরোশো পঞ্চাশ'। (পৃ-৪৩৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড)

চম্পার আত্মহত্যার মতই মেয়েকেই তাদের সতীত্বকে আত্মহুতি দিতে হয়েছিলো মন্বন্তরের কামনার অগ্নিতে। গল্পের শেষে সমাজের অতুগ্র কামনার অগ্নিতে বলি হওয়া মেয়েদের রঞ্জন লক্ষ্য করেছে কলকাতার রাস্তায়, দেহপসারী নারীদের মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে চম্পার মত নারীদের অসহায়তাকে-

> 'বড়লাট বলেছেন দেশে দুর্ভিক্ষ আসবে। অ্যাটম বোমার ব্যাপার ও ইরানের তেল নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই লাগাটা অসম্ভব নয়। আসন্ন রাষ্ট্রবিপ্লবের আশংকার ভারতবর্ষের সর্বত্র সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রে প্রস্তুতি চলছে। ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছি, এমন সময় দেখি একজন মিলিটারী গোরার বাহুবন্ধনে সালোয়ার পরা ভারতীয় মেয়ে। খুব সম্ভব বাঙালী'। (পৃ-৪৩৮ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড)

এতক্ষণ পর্যন্ত লেখকের গল্পে আমরা পেলাম অবক্ষিত সমাজ ও অবক্ষ্যিত ব্যক্তি মানসের রূপকে। এবার লেখক তার ভাঙ্গা চশমা গল্পে দেখালেন অবক্ষয়িত আদর্শ ও চিরন্তন আদর্শের দ্বন্দ্বকে। এই দ্বান্দ্বিক পটভূমিতে গল্পটি রসতীর্ণ হয়ে উঠেছে। দেখা যাক গল্পের কাহিনিতে কি রয়েছে।

গল্পের নায়ক মফঃস্বল এলাকার ষাট টাকার বেতনের স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার। শিক্ষাগত যোগ্যতা এম.এ. পাশ। দুর্ভিক্ষের বাজারে তার টানাটানির সংসার। স্কুলের চাকরিতে তার আর্থিক সংকুলান হয়ে উঠে না, অনেক উন্নতির আশায় আশাহত মনে তার প্রশান্তি নেই। আর্থিক অস্বচ্ছলতায় টানাটানির সংসারে বুধ প্রিয়ার সঙ্গে তার রোমান্স সর্বদাই বিঘ্নিত। কিন্তু মন্বন্তর তার সামনে উন্নতির দরজা খুলে দেয়। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের রিলিফের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রয়োজন। আর্থিক স্বচ্ছলতাকে বদ্ধ পরিকর করতে নায়ক স্কুলের মাস্টারী চাকরি ছেড়ে ছোটে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ পদে ইন্টারভিউ এর জন্য। যথারীতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নায়ক যখন পারমানেন্ট ডেপুটি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর, তখনি সে লক্ষ্য করেছে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের হাহাকার ও তার নগ্ন রূপকে-

> 'উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে। এতদিনে কেন যে দালালে নিয়ে যায়নি সেইটেই আশ্চর্য। অনাহারে শীর্ণ হলেও যৌবনশ্রী এখনও প্রকট, আর শতজীর্ণ গাত্রবাসের ভিতর দিয়ে সেই যৌবন অসহায় করুণতায় নিজেকে বাইরের আলোতে মেলে ধরতে পেরেছে। দেখলাম হৃদয়ের চোখে আগুন। খাতায় সে নাম লেখেছে বটে, কিন্তু দৃষ্টিটা মরা গোরুলোভী শকুনের মত তীক্ষ্ণ আর নির্লজ্জ।' (পৃ-৬৬৮ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী খণ্ড-২)

এর পরেই লেখক এক পাগল স্কুল মাস্টারকে গল্পের প্রেক্ষাপটে এনেছেন গল্পের মূল মর্মকে বুঝাতে। রিলিফের খাদ্যবস্তু বন্টনে নায়কের সাথে সাক্ষাৎ হয় এই পাগল স্কুল মাষ্টারের। গ্রামের সকলই এই মাষ্টারকে পাগল আখ্যা দেওয়ার নায়ক ততটা থাকে প্রাথমিক ভাবে গুরুত্ব দেয়নি। এক সন্ধ্যারাত্রিতে যখন নায়ক তার কর্মজীবনের উন্নতির আনন্দে ও আত্মপ্রসাদে নিজের বধু প্রেয়সীর সঙ্গে রমান্সের ভাবনায় নিমগ্ন ঠিক তখনি সেই পাগল মাস্টারের উপস্থিতি। পাগল মাষ্টারের অনুরোধে ও নিজে একজন শিক্ষক হওয়ার সুবাধে নায়ক যেতে হয়েছে পাগল মাস্টারের ইস্কুলে। সেখানে সে লক্ষ্য করেছে শিক্ষকতার মহান আদর্শকে-

> ‘এই আমার স্কুল সারজীবন তিল তিল করে গায়ের রক্ত দিয়ে একে গড়ে তুলেছিলাম। বৌয়ের হার বিক্রি করে চালা উঠিয়েছি, মনে আশা ছিল দেশের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবো, হেড্ মাস্টার হবো। কিন্তু স্যার কেন এল দুর্ভিক্ষ? কোথায় গেল আমার ছাত্রেরা? না খেয়ে মরে গেল, পালিয়ে গেল শহরে। আমার সারা জীবনের সব কিছু স্বপ্ন এমন করে কে শেষ করে দিল বলতে পারেন!’ (পৃ-৪৩৭ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী খণ্ড-২)

দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে পাগল স্কুল মাস্টারের শিক্ষার আদর্শে গল্প নায়ক নিজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে তার স্বার্থান্ধতাকে। দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে একদিকে এক পাগল মাস্টার নিজের সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে রক্ষা করেছে শিক্ষার আদর্শকে অন্য দিকে আর এক ইস্কুল মাস্টার দুর্ভিক্ষের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য স্কুলের আদর্শকে ত্যাগ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ পদকেই তার জীবনের অন্যতম সফলতা হিসেবে বলে মনে করেছে। এই দ্বান্দ্বিক পটভূমিকাতেই আদর্শের অবক্ষয় সূচিত হয়েছে। গল্পের শেষে লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন-

‘পায়ের নিচে ঝড়া আমের পাতাগুলো মড়্ মড়্ করতে লাগল। যেন চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছি আমি। মনে হলো বিদ্যার এই তীর্থে আমার থাকবার অধিকার নেই- আমার ছোঁয়াতে এখানকার সব কিছু মলিন হয়ে যাবে। আমি ব্রতচ্যুত, লোভী, স্বার্থপর’। (পৃ-৪৭৪ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী,খণ্ড-২)

গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার বর্ণনাধর্মীতা। বর্ণনার গুণে তাঁর গল্পগুলি সজীব হয়ে উঠেছে। তেরোশো পঞ্চাশের মানুষের হাহাকারের এমন জ্বলন্ত চিত্র ও মানবিক মূল্যবোধে অবক্ষয়িত সমাজ বাংলা সাহিত্যে খুব কমই রয়েছে। গল্পের চরিত্রগুলির অর্ন্তঃমুখীন ভাবনায় ও ভবিষৎ দিনের এক ভয়াবহ আশঙ্কাকে, সর্বপরি আদর্শের দ্বন্দ্বকে যেভাবে লেখক গল্পের পরিসমাপ্তিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘বর্ষাযাপন’ কবিতায় উল্লেখ করেছেন-

‘নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ’।।

আলোচ্য ছোট গল্পগুলিতে লেখক বিরক্তিকর বর্ণনার ছটা দিয়ে গল্পগুলিকে রাঙ্গানোর কোনো প্রয়োজন অনুভব করেননি। কোন তত্ত্ব বা উপদেশ তিনি দেন নি, তিনি শুধু তার সীমিত পরিসরে বর্ণনার শিল্পকুশলতাকে প্রয়োগ করে গল্পের মধ্যে টেনে নিয়ে আসলেন বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে যা একজন উচ্চাঙ্গ প্রতিভার সাহিত্যিক সর্বদাই করে থাকেন তার ‘প্রসাদ গুণে’। অনিবার্যভাবেই গল্পগুলি পাঠ করলেই এক অজানা বিভৎসের অনুমানে ও পরিচিতিতে পাঠক মনে এক অনাস্বাদিত রসের সৃষ্টি হয় একথা নিঃসন্দেহে, সংশয়াতিত ভাবে বলা যেতে পারে। এখানেই সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্প কুশলতা ও শিল্প সার্থকতা।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা : দে’জ পাবলশিং, ১৪১০, মুদ্রণ।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা মর্ডাণ বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৪৫, মুদ্রণ।
৩. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, সাহিত্যের রূপ নীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা : রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ১৯৯৫, মুদ্রণ।

৪. দেবী, আশা, সম্পা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৬৯, মুদ্রণ।
৫. --- নারায়ণ, গঙ্গোপাধায়ের রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯, মুদ্রণ।
৬. --- নারায়ণ, গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯, মুদ্রণ।
৭. মুখোপাধ্যায়, অরুণ, কালের পুত্তলিকা, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০০৫ মুদ্রণ।
৮. --- কালের প্রতিমা, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, মুদ্রণ।
৯. মুখোপাধ্যায়, অসিত, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তি, কলকাতা : মর্ডাণ বুক এজেন্সি, ১৯৯৮, মুদ্রণ।